তবু প্রত্যয়ে অক্ষত বাঙালি

অনিরুদ্ধ আহমেদ

এক

বাঙালি জাতির জীবনে প্রাপ্তি ও আনন্দে পরিপুর্ণ এমন দিনটি কখনই আসেনি আগে। আমাদের স্বপ্ন ও সংগ্রামের সম্মিলিত অর্জনে আমাদের এক আশ্চর্য অহঙ্কারের মহৎ দিন ষোলোই ডিসেম্বর। নব্য উপনিবেশবাদীদের প্রশিড়িাত সেনাবাহিনীর আনত আত্মসমর্পণে , বাংলাদেশের জলে স্থলে অন্তরিড়্গে জয় বাংলা ধ্বনির এমন অহঙ্কৃত ঝঙ্কারে , গণতান্ি¸ক শক্তির এমন দুর্বার দুর্জেয় বিজয়ে এই ষোলোই ডিসেম্বর দিনটি আমাদের জন্যে সব চেয়ে গৌরবের , সব চেয়ে ভালোবাসার , সব চেয়ে প্রিয় । বাংলাদেশের মানুষের চোখে সেদিনের সেই আনন্দাশ্রম্ন , প্রিয় ও পরিচিতদের হারানোর বেদনাকে অতিক্রম করে দেশমাতৃকাকে হৃদয়ের কাছাকাছি আপন করে পাবার সেই অনুভুতি অনপনেয় হয়ে থাকবে আমাদের ইতিহাসে অনাদিকালেও। সন্দেহ নেই মোটেও যে আমাদের সেই অর্জনের প্রক্রিয়ায় বিবাদ ও বিতর্ক ছিল অনেক , বিষাদ ও বেদনা ছিল সুগভীর কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা এমন এক সাফল্যের সোপান বেয়ে উঠলাম যে কুয়াশা"ছন্ন সেই ডিসেম্বরের শেষ সুর্যটিও তার সবটুকু আভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। শীতের সন্ধ্যায় আমরা স্বাধীনতার উষ্ণতায় ওড়ালাম আমাদের লাল সুর্যাঙ্কিত সেই সবুজ পতাকা যার প্রতীড়্গায় কেটেছে আমাদের ঔপনিবেশিক দিনের প্রতিটি মুহুর্ত। সেই পতাকাতো কেবল আমাদের আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতার চিহ্ন নয় , গণতন্ে¿র প্রতি আমাদের আজীবন নিবেদনের প্রতীক, অসাম্প্রদায়িকতা ও ধর্ম নিরপেড়্গতার দিকে আমাদের সম্মুখ যাত্রারই বিজয় কেতন। ১৯৭১ সালের পরাজিত বিদেশী শত্রম্ন এবং তাদের পদলেহী দেশী আজ্ঞাবহরা এই পতাকার বিরোধী এবং অতএব পতাকা যে সব উপাদানকে রড়্গণ ও লালন করতে সাংবিধানিক ভাবে প্রতিজ্ঞ সেই সবের বিরোধী ও তারা। তারা বিরোধীতা করে আমাদের হৃদয়ে নিত্য অনুরণিত জাতীয় সঙ্গীতের ও। জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি তাদের এই অবমাননাসুচক দৃষ্টিভঙ্গি অসঙ্গত এক সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত যাকে আমরা একাত্তরেই জলাঞ্জলি দিয়েছি ।

দুই

আজ যে ইসলামি সন্¿াসবাদীদের উদ্ভব ঘটেছে বাংলাদেশের শ্যামল কোমল মাটিতে , সেটি বিস্ময়ের বিষয় হলেও , এর বীজ বপন করা হয়েছে দীর্ঘ দিন ধরেই। মুসলমান বাঙালি যে পরিচিতি

সঙ্কটে পড়েছে কখনও কট্টর হিন্দু বাঙালির কাছ থেকে , কখনও মুসলমান উগ্রপন্থিদের কাছ থেকে , সেই নরম মাটির ওপরই ইসলামি ভেদবুদ্ধির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়েছে কালক্রমে। সেই পরিচিতি সঙ্কটকে আমরা নিদ্ধিধায় কাটিয়ে উঠেছিলাম একাত্তর কেন্দ্রিক সংগ্রামের আবর্তে। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলেরই রক্তক্ষারণ আমাদের একটি অভিন্ন পরিচয়ে জগৎবাসীর কাছে উপস্থাপন করেছিল কিন্তু দ্বিজাতিতত্ত্বের বিষাক্ত সংক্রমণ থেকে কিছু লোক যে শুদ্ধ হয়নি একাত্তরের সূর্যস্নানেও , সেতো আমরা সকলেই জানি। তারাই তো একাত্তরের প্রতি দিন প্রতি রাত পাকিস্তানি সেনাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল স্বাধীনতাকামী সুশীল সংবেদনশীল মানুষের খোঁজে । মুণীর চৌধুরী , আলিম চৌধুরী , সেলিনা আক্তার , জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা , কুন্ডেশ্বরীর নতুন বাবুরা তাদেরই লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিলেন। জাতির জন্যে এ বড়ই লজ্জার বিষয় যে আমাদেরই স্বভাষী , স্বধর্মী মানুষ যারা বিক্রীত পাকিস্তানী সাম্প্রদায়িক কুটীলতায় এবং অতএব বিকৃত ও বটে , তারাই তো হয়ে উঠলো আমাদের স্বাধীন সত্বার সব চেয়ে বড়ো শত্রম্ন। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে , রাষ্ট্রপিতার উদার সমন্বয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গির পুর্ণ সুযোগ নিয়ে এই বিজাতীয় ব্যাধিটি , রাষ্ট্রদেহের গভীর গোপনে লুকিয়ে রইলো। স্বাস্থ্য নয় , ব্যাধিই সংক্রামক এই প্রবাদপ্রতিম বাক্যের মতোই উগ্র ধর্মবাদের ব্যাধি ধীরে ধীরে বিস্তৃত হলো আমাদের সমাজদেহে। এর পেছনে মুল কারণ বোধ করি , রাষ্ট্রিক পৃষ্ঠপোষকতা। বঙ্গবন্ধুর সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে রাষ্ট্রিক পর্যায়ে ধর্মের ব্যবহার হয়েছে কেবল ধর্ম হিসেবেই এবং সকল ধর্ম সমান মর্যাদা পেয়েছে প্রচার মাধ্যমে কিন্তু ধর্মকে তিনি রাজনীতিতে প্রযুক্ত হতে দেননি কারণ রাজনীতি ও ধর্মের কুটিল মিতালিতে কি পরিণতি হতে পারে সে কথা তাঁর অজানা ছিল না । যে বাঙালি হিন্দু মুসলমান পাশাপাশি বাস করেছে শত শত বছর ধরে , অভিন্ন লোকজ সংস্কৃতিতে যার লালন , সেই দুই ধর্মাবলম্বী উপমহাদেশের অন্যত্র যেমন তেমনি বাংলায় ও কুড়ি শতকের প্রায় মাঝামাঝি এসে যে প্রাণঘাতি দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছিল সে কথা আমাদের সকলেরই জানা। তখন আমরা সে সব দাঙ্গার জন্যে ইংরেজদের , " বিভাজন করো এবং শাসন করো" নীতিকে দায়ী করেছি। কিন্তু ইংরেজ বিতাড়িত হবার পরও , ভারত ও পাকিস্তানে এই সাম্প্রদায়িক বিভাজন অপসৃত হয়নি বরঞ্চ তা রাষ্ট্রিক অবয়বে আরো উগ্র ভাবে প্রকাশিত হয়েছে । বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর অনুমান করা গিয়েছিল যে এই ব্যাধিটিকে উন্মুল নির্মুল করা সম্ভব হয়েছে দেশটির সৃজন প্রক্রিয়ায় হিন্দু - মুসলমানের সম্মিলিত শোণিত প্রবাহের মাধ্যমে । কিন্তু আমাদের সেই প্রত্যাশা পুরণ হয়নি, মুলত স্বাধীনতা বিরোধীদের শনৈঃ শণৈঃ শক্তি বৃদ্ধিতে। এ ক্ষেত্রে আমাদের দুর্ভাগ্য রাষ্ট্রিক পৃষ্ঠপোষকতাই স্বাধীনতার বিপক্ষের শক্তিগুলোকে ক্রমশই বিস্তৃত হতে দিয়েছে।

তিন

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রসঙ্গে সে দিন এক ঘরোয়া আলোচনার সময়ে আমার এক বিদেশী বন্ধু কিছুটা বিষ্ময় এবং অনেকটা বিদ্রুপ করেই বললেন , আর কতদিন আপনারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলবেন ? তাঁর কথাতে শ্লেষ ছিল হয়ত কিন্তু একেবারেই উড়িয়ে দেওয়ার কথা নয় এটা। তাঁর নিজের রাষ্ট্রিক চেতনায় তাঁর স্বাধীনতার অনুভূতি নিয়ে প্রশ্ন তুলতে হয়নি কখনই কারণ তাঁর দেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে ইতিহাসকে নিয়ে এতো খানি বিকৃতির খেলা খেলেনি কেউ যেখানে মুল ইতিহাস থেকে অনেকটা দুরে সরে আসতে হয়েছে জনগণকে এবং নতুন প্রজন্মকে বিকৃতি ও বিভ্রান্তির মধ্যে শিখতে হয়েছে ফরমায়েশি পাঠ্যপুস্তকের ইতিহাস । সরকার পরিবর্তন সব দেশেই ঘটে এবং সেটাই গণতান্ত্রিক নিয়ম কিন্তু দেশ , দেশের স্বাধীনতা , পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীত , মৌল আদর্শ এগুলো বদলাতে উদ্যত হয়না কোন সরকার। কিন্তু লজ্জার বিষয় হলেও এ কথা সত্যি যে আমাদের জাতীয়তাবোধে কোথায় যেন একটা ফাঁক রয়ে গেছে। আমরা কি এখনও দ্বিজাতি তত্ত্বের আয়ত্ব থেকে বেরিয়ে আসতে পারিনি ? আমাদের মনের গভীর গোপনে কি আমরা আবার রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মের একটা অযৌক্তিক সমীকরণ সাধনের চেষ্টা করছি ? এ সব জিজ্ঞাসার সম্মুখীন আমাদের হতেই হবে। এমন কী জাতীয়তাবাদের মতো এমন যে আবশ্যিক শব্দ যে কোন জাতির নির্মাণে , তার স্বাতন্ত্র্য ও স্বাজাত্য প্রকাশে সেখানেও তো আমরা লড়্যা করি দলীয় রাজনীতির মাত্রা যুক্ত হয়ে তার আদি অর্থ গেছে পাল্টে। এখন যখন ড়্গমতাসীন জোটের নেতা নেত্রীরা জাতীযতাবাদী শক্তির বিকাশ কামনা করেন , তখন কার্যত তাঁরা সেই জাতীয়তাবোধেরই বিনাশ সাধন করেন যা আমাদের রাষ্ট্র নির্মাণের মুল ভিত্তি ছিল। এই যে শব্দের ব্যাপ্তি ও ব্যঞ্জনায় অনায়াসেই পরিবর্তন আনছে শাসক গোষ্ঠি সেটিও তো আমাদের সেই চেতনার প্রতিই চ্যালেঞ্জ যার উদার চত্বরে দাঁড়িয়ে বাঙালি লড়াই করেছিল একাত্তরের বসন্ত্ম থেকে শীত অব্দি। জাতীয়তাবাদ নামের সেই প্রিয় শব্দটি এখন বন্দী হয়ে পড়েছে দলীয় রাজনীতির আবর্তে এবং আমার মতো সাবধানী মানুষ , শব্দ নিয়ে কারবার যার মাঝে- মধ্যে , সে অতি সন্তর্পণে এই জাতীয়তাবাদ শব্দটিকে পরিহার করে চলেছে। এখন আমার প্রিয় শব্দ বরঞ্চ জাতীয়তাবোধ , যা আমার হৃদয় থেকে উৎসারিত , আমার দেশের মাটি ও মানুষের সঙ্গে সম্স্নৃক্ত।

চার

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সম্বন্ধে আমার সেই বিদেশী বন্ধুর বিস্মিত জিজ্ঞাসার জবাব দেয়া কঠিন কারণ তিনি এবং তাঁর দেশ সেই সব ভয়াবহ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাননি , যার মধ্য দিয়ে গেছি আমরা , আমাদের দেশ। তাই মুক্তি যুদ্ধের চেতনা কথাটি অতি ব্যবহারে জীর্ণ হয়েছে বটে , পুরোনো মুদ্রার মতো এর বাইরের দিকটি ড়্গয়ে পড়ছে হয়ত কিন্তু মুদ্রার মুল্যায়ন যেমন ভিন্ন মাপকাঠিতে হয় , আমাদের এই অতিব্যবহৃত মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ও মুল্যায়নের মাপকাঠিটা ভিন্ন। এই চেতনার

পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন রয়েছে প্রায়শ্চিত্তের জন্যেই বাঙালি যেদিন হতবাক হয়ে দেখলো যে ঘাতকের দল বন্দুকের নলে বাংলাদেশের প্রথম সরকারের পতন ঘটালো , গুজব ও বিভ্রান্তির সুযোগকে কাজে লাগিয়ে, জাতির জনককে সপরিবারে হত্যা করলো কয়েকজন ভ্রষ্ট সৈনিক , যখন বাংলাদেশ বেতার হয়ে গেল , রেডিও বাংলাদেশ , যখন জয় বাংলা ধ্বনিটি হলো বাংলাদেশ জিন্দাবাদে রূপান্তরিত তখন থেকেই মনে হলো হাঁটি হাঁটি পা পা .... পাকিস্তান , এমনটিই বোধ হয় ঘটছে বাংলাদেশের ভাগ্যে। এর পর সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় মুক্তিযুদ্ধকে , এর আদর্শকে খাটো করার সার্বিক প্রচেষ্টা নেয়া হলো খুবই পরিকল্পিত উপায়ে । আমাদের এ ও এক দুর্ভাগ্য যে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে যে মেজর সর্বাধিক পরিচিতি লাভ করেছিলেন , ছলে বলে কৌশলে ক্ষমতা দখলের পর তিনিই মুক্তিযুদ্ধের সক্রিয় প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ালেন। স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসের প্রথম স্বৈরশাসক জেনারেল জিয়াউর রহমান অনুমান করি মনে প্রাণে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী ছিলেন না । স্বাধীনতার ঘোষক না হয় তিনি না-ই বা হলেন কিন্তু লড়াইয়ের সুচনায় তিনি যে একটা ভুমিকা পালন করেছিলেন এবং পুর্ণদ্যোমে তিনি যে মুক্তিযুদ্ধ করেছিলেন , সেটি আমাদের জানা ইতিহাস । তা হলে জিয়া মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীদের সঙ্গে এমন গাঁটছড়া বাঁধলেন কেন ? বাঁধলেন বোধ করি সেই একই কারণে , যে কারণে তাঁর বিধবা স্ত্রী প্রচন্ড চাপের মুখে এখনও পরিত্যাগ করতে পারছেন না তাঁদের পরীক্ষিত মিত্র পাক পন্থিদের । কারনটি দলীয় রাজনীতির , ভোটের হিসেবের। ১৯৭৫ সালের নভেম্বরে জিয়া যখন কর্ণেল তাহেরের কাঁধে বন্দুক রেখে কার্যত ক্ষমতার শীর্ষ বিন্দুতে পৌঁছুলেন , তখনতো আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতারা নিহত । তবু ক্ষমতায় টিকে থাকার ব্যাপারে জিয়া কোন ঝুঁকিই নেননি। অতি ডানপন্থি ও অতি বামপন্থি যাঁরা উভয়ই মুজিব বিরোধীতায় ছিলেন অভিন্ন তাঁদেকে জিয়া একই মঞ্চে নিয়ে আসলেন আর সমান্তরালে চালালেন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের বিকৃতি। বাজারে প্রচলিত আওয়ামী নেতৃবৃন্দ সম্বন্ধে কিছু মুখরোচক গুজব (যা পরে পরিকল্পিত ও সর্বৈব মিথ্যে বলে প্রমাণিত হয়) 'এর উপর ভর করে জিয়াউর রহমান তাঁর রাজনৈতিক কলা কৌশল চালিয়ে যান। যে নেতার নেতৃত্বে তিনি যুদ্ধ করেছিলেন নয় মাস , তার ঘাতকদের তিনি পুরস্কৃত করলেন বিদেশী দুতাবাসে চাকরী দিয়ে , তাঁকে জাতির জনকের প্রাপ্য মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করতে তিনি কার্যত সব কিছুই করেছিলেন । এতে বি এন পি 'র জন্যে রাজনৈতিক ফায়দা এসছিল প্রচুর কিন্তু তা এসছিল একটি জাতিকে তার মৌল চেতনা থেকে বিচ্যুত করার চওড়া মুল্যে। সেই মুল্য গুনতে হয়েছিল মুক্তিযোদ্ধা জিয়াকেও , তাঁর নিজের জীবনের বিনিময়ে কিন্তু ততদিনে দেশের যে সর্বনাশ করার তা তিনি করে ফেলেছেন।অন্তত জাতীয়তাবাদ প্রশ্নে একটি একতাবদ্ধ জাতিকে , জিয়া বিভক্ত করেন কৌশলের সঙ্গে। বাংলাদেশের সংবিধানে অযথা সংশিস্নষ্ট হয় " বিসমিলস্নাহ হির রহমান হির রহিম", যা কীনা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশটির জন্যে আদৌ কোন প্রয়োজন ছিল না। কয়েক বছর আগেই তো ইসলামিক ফাউন্ডেশান স্থাপন করে বঙ্গবন্ধু ইসলাম বিষয়ে গবেষণার জন্যে অর্থ বরাদ্দ করেছিলেন

। কিন্তু সংবিধানে ধর্মকে সংশেস্নষণ করে জিয়া রাষ্ট্রের চরিত্র বদলাতে উদ্যত হন। আর তারই ধারাবাহিকতায় এরশাদ এগিয়ে যান আরও কয়েক ধাপ । ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম ঘোষণা , বেতার ও টিভিতে আজান , শুক্রবারকে সাপ্তাহিক ছুটি ঘোষণা করে এরশাদ রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধর্মের সঙ্গে একাকার করে ফেলেন। তার পরের কোন সরকারই ফিরে যেতে পারেননি আগের অবস্থায় কারণ তাঁরা সকলেই কষেছেন ভোটের অঙ্ক। রাষ্ট্রের এই চরিত্র হননে ৭৫ পরবর্তী পরিকল্পিত প্রচেষ্টারই ফল হ'ছ , বাংলাদেশে এমন একটি প্রজন্মের উত্থান যারা ইতিহাস সম্পর্কে ভুল তথ্য পেয়েছেন। আওয়ামী লীগের দ্বিতীয় আমলে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চর্চার দিকে দৃষ্টি দেয়া হয়েছিল যদিও সে প্রচেষ্টা ও দলীয় আবর্তে আবদ্ধ ছিল অনেকখানি। তবে সেই সময়কার এক তরুণ আমাকে বলেছিলেন , আমরাতো আগে কখনই শুনিনি যে শেখ মুজিব এতো বড়ো মাপের নেতা ছিলেন। আমাদের শেখানো হয়েছিল জিয়াই প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা । অন্য এক তরুণকে দেখেছি বিস্ময়ের সঙ্গে শুনেছেন বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণ, বলেছেন এসন অসাধারণ ভাষণ তিনি আগে শোনেনি কখনও ? সত্যিই তো । কি অপরাধ ছিল শেখ মুজিবের যে অমন এক জাতীয়তাবোধ পূর্ণ ভাষণ থেকে জনসাধারণকে বঞ্চিত করেছেন জিয়া থেকে জিয়া পত্নী সকলেই। এসব কিছুই প্রমাণ করে যে আমরা সম্পূর্ণ একটি প্রজন্মকে ভিন্ন খাতে পরিচালিত করেছি , পাঠ্যপুস্তকের বস্তুনিষ্ঠতা জলাঞ্জলি দিয়ে।

পাঁচ

আজ তাই বিজয়ের প্রসন্ন অনুভূতির পাশে , অজানা আশঙ্কায় আমরা যখন বিষন্ন বোধ করি , তখন আমাদের এক মাত্র উপায় হ'ছ সেই অনুভবে ফিরে যাওয়া যেখান থেকে বাংলাদেশ রাস্ট্রটির জন্ম। এখনকার সংকট প্রকৃত পড়্গে এক ধরণের অগণতান্ত্রিক আদর্শ প্রতিষ্ঠার মরিয়া উপায় । সে জন্যে সংকটকে লালন করছে যে আদর্শ , অর্থাৎ রাজনীতির সঙ্গে ধর্মকে মিশিয়ে ফেলার প্রবণতা সেটা সবার আগে বন্ধ করতে হবে। কোন জাতীয় ঐক্যই সম্ভব নয় , এমন সব উপাদানকে সঙ্গে রেখে যারা বাঙালি জাতির অস্তিত্বেই বিশ্বাস করে না , যাদের বাংলাদেশ , মুসলিম বাংলার নামান্তর মাত্র। কাজেই আমাদের সেই প্রিয় পুরোনোর মুদ্রা মুল্যায়নে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার উন্মেষ ঘটাতে হবে , শিড়্গা প্রতিষ্ঠনে , প্রচারমাধ্যমে এবং এমন এক রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে যার মুক্তি শক্তিতে নয় , যুক্তিতে। তবে এর সব কিছুই সম্ভব যদি দেশে এমন কোন সরকার আসে যারা ভোটের হিসেবে জলাঞ্জলি দেবে না রাস্ট্রের স্বার্থ এবং ধর্মব্যবসায়ীদের রাজনীতি থেকে দুরে থাকতে আইনগত ভাবে বাধ্য করবে।

বিজয় দিবস এসছিল এবার আতঙ্কের আশঙ্কার মধ্যে কিন্তু নৈরাশ্যের কোন বিষন্নতা বাঙালিকে আ”ছন্ন করতে পারেনি বরঞ্চ মনে হলো , বাংলাদেশের মানুষ এই ডিসেম্বরেও তেমনি সাহস নিয়ে বিজয়ের গান গেয়েছে , যেমন গেয়েছিল আরেক ডিসেম্বরের প্রায় গোধুলি বেলায়।

[এই নিবন্ধটি যুগান্তরে প্রকাশিত]